



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 424 - 427

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘মুক্তধারা’ : অভ্যন্তরীণ লৌহযন্ত্র ও ভৈরব-মন্দির চূড়ার ত্রিশূল - প্রতীক ও প্রত্যয়

অরুণ সিং

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

নারায়ণগড় সরকারী মহাবিদ্যালয়

Email ID : arupsing4as@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Rupok-Sanketik,
Daswata,
Amavasya,
Musti, Surjasto,
Gotipoth, Bandh,
Nandisankat,
Jantra, Praloy.

Abstract

We know that a writer's literary works is based on personal experience. Literature is indeed a reflection of the world. Rabindranath, the doyen of Bengali literature, lived a long life and garnered lots of experience. As his bag of experience filled up, he advanced towards the new era, whereby he established his creative mark, recognising the necessity of this new world order. Not stability but mobility is the true spirit of his creative endeavours. After the Second World War, Rabindranath went on a tour of Europe and America and saw the increasingly terrible image of machines in the role of post-war destruction and felt concerned to see people being bound to the slavery of machines. After returning to the country, he protested by composing the metaphorical-symbolic play 'Muktadhara'. Rabindranath's 'Muktadhara' is a deeply symbolic play. The head of the iron instrument and the trident on the top of the Bhairav temple represent two opposite concepts: the head of the iron instrument, which symbolises technocracy, the arrogance and intoxication of mechanical civilisation, and the trident on the roof of the Bhairav temple, which symbolises deism and spiritual power. In our study, we have tried to review how these two symbols explain the basic theory of the play.

Discussion

সামান্য লক্ষণের সমতা সত্ত্বেও প্রতীক বা সংকেত কিন্তু রূপক নয়। রূপকে রূপান্তরে দেখাবার ইচ্ছা থেকেই রূপকের জন্ম। অরূপকে রূপের মধ্যে প্রকট করার বাসনাই প্রতীকের উৎস। রূপক নৈতিক উদ্দেশ্যের সৌন্দর্যময় ছদ্মবেশ। প্রতীকী সংকেত তত্ত্বানুভূতির আত্মপ্রকাশ। রূপকে সামঞ্জস্যপূর্ণ আখ্যানযুগলের স্বাভাবিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। অসামঞ্জস্য স্বতন্ত্র আখ্যানকে ভিত্তি করে রূপের মাধ্যমে রূপান্তরিত করে ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য জ্ঞাপিত করাই প্রতীকের অভিপ্রায়। রূপকের আবেদন বুদ্ধির দরজায়, সংকেতময় প্রতীকের আবেদন অনুভূতির দরজায়। রূপক বুদ্ধির সীমায় বন্দী করে, প্রতীক ভাবের অপরিসীমতায় মুক্তি দেয়। রূপক বাচ্যার্থের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ, প্রতীক বাচ্যার্থের সীমা অতিক্রম করে ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ। প্রতীক মুখোশের

হিরন্ময় অবগুণ্ঠন অপসারিত করে মুখশ্রীকে মুক্তি দেয়, অভিব্যক্তিকে বাচ্যাতিরেকের বিপুল ব্যঞ্জনাময় আবেগে সংক্রামিত করে।

প্রাজ্ঞজনেরা তিনরকম প্রতীকের কথা বলেছেন – প্রতীকাভাস, খন্ড প্রতীক ও পূর্ণপ্রতীক। আবেগের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য রচনার কোন অংশ যখন তার নির্দিষ্ট অর্থকে অতিক্রম করে ব্যাপক ব্যঞ্জনার সংকেতে গভীরতর তাৎপর্যে মণ্ডিত হয় তখন সেই গভীরায়মানতার নাম প্রতীকাভাস। শেক্সপিয়ারের ‘কিং লিয়ার’ নাটকের জনহীন তৃণগুন্ডাবৃত প্রান্তরে ঝঞ্ঝা বিভ্রান্ত লিয়ারের দৃশ্যে প্রান্তর ও ঝঞ্ঝা তাৎপর্যে আপন সীমানা অতিক্রম করে কন্যাপরিজন-পরিত্যক্ত বৃদ্ধের জীবনের সমার্থক হয়ে উঠেছে, লিয়ারের প্রচণ্ড ক্ষোভ ঐ ঝঞ্ঝার মধ্যে আত্ননাদ করছে, ঐ নির্জন প্রান্তর ও প্রলয়ঝঞ্ঝা মানবজীবনের নিরর্থকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। তাই সে দৃশ্যটি প্রতীকাভাসের উদাহরণ। যে প্রতীক রচনার মধ্যে দু’একবার মাত্র ব্যবহৃত হয় তার অংশবিশেষের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, রচনার ভিত্তির সঙ্গে যার কার্যকারণগত সম্বন্ধ নেই তাকে খন্ড প্রতীক বলে। যেমন রবীন্দ্রনাথের ‘প্রকৃতির প্রতিশোধ’ নাটকে সন্ন্যাসীর গুহা। যে প্রতীককে বাদ দিলে নাটকে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, যার ভিত্তির ওপর সমগ্র রচনাটি প্রতিষ্ঠিত, যা নাটকের মেরুদণ্ডস্বরূপ সে প্রতীকই পূর্ণ প্রতীক। যেমন – ‘ডাকঘর’ নাটকের ডাকঘর, মুক্তধারার বাঁধ, রথের রশির রশি পূর্ণ প্রতীকের উদাহরণ।

‘মুক্তধারার’ বাঁধ এক দুঃসহ সত্য। নাটকের সব পাত্র-পাত্রী বাঁধটাকে বিশ্বাস করে। কেউ তাকে ক্ষতিকর, কেউ বা উপকারী মনে করে। সবার মনের মধ্যে বাঁধের প্রতিক্রিয়া সক্রিয়। অধিকন্তু নাটকের কাহিনীটাই বাঁধ বাঁধার ও বাঁধ ভাঙার। সুতরাং গল্প, নাটক ও প্রতীক এখানে একাত্মক। নাটকের শুরুতেই বাঁধের যন্ত্র ও ভৈরবমন্দিরের চূড়ার ত্রিশূল এমন কৌশলে ব্যবহৃত হয়েছে, ভৈরবপন্থী ও যন্ত্রবাদীদের কোরাস এমন ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে যা গভীর একাত্মতায় নাটকের মূল দ্বন্দ্বকে অপরিসীম দক্ষতায় প্রতীকিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ‘মুক্তধারা’ নাটকে ব্যবহৃত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীকের একটি দূর আকাশে দৃশ্যমান লৌহযন্ত্রের অভ্রভেদী শীর্ষদেশ আর অন্যটি হল লৌহযন্ত্রের বিপ্রতীপে ভৈরব-মন্দির চূড়ার ত্রিশূল। সমগ্র নাট্যক্ষেত্র থেকে তা দৃশ্যমান। উত্তরকূটের একদিকের আকাশে লৌহযন্ত্র ও অন্যদিকের আকাশে ভৈরব-মন্দির চূড়ার ত্রিশূল, দুই বিপরীত দিকে এ দুটি প্রতীকের অবস্থান একটি অপরের দ্বন্দ্বকে স্পষ্টতা দিয়েছে। এ অনপনেয় বিরোধের মূলে আছে উত্তরকূটের দেবলজ্জ্বী স্পর্ধা ও মানবকল্যাণবিরোধী বিশ্ববিমুখ স্বার্থপরতা। সমস্ত মানুষের জন্যে ভৈরব যে মুক্তধারার জল দান করেছেন, উত্তরকূটের স্পর্ধিত মানুষ নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে তাকে বন্দী করেছে, আপামর লোকসাধারণের সম্পত্তিকে অঞ্চলবিশেষের সম্পত্তিতে পরিণত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। সকলের দেবতা ভৈরবকে উত্তরকূটীয়েরা কেবল নিজেদের মনে করে তাঁর দানকে শুধু আপনাদের ভাগ্যরূপে গণ্য করেছে। ফলে প্রকৃত দেবতা শক্তিমদমত্ত উত্তরকূটের কাছে স্বার্থসাধনের উপকরণে পরিণত হয়েছে। দেবতার বিধানকে তারা লঙ্ঘন করেছে এবং সেই লঙ্ঘনের গৌরবে গর্বিত উত্তরকূট তাঁকে সম্ভ্রষ্ট করার জন্যে সানন্দ সমারোহে পূজার আয়োজন করেছে। এই পূজার মধ্যে সংকীর্ণ স্বার্থচিন্তা সক্রিয়। রঞ্জিতের সংলাপে তার প্রমাণ স্পষ্ট –

“রণজিৎ। যিনি উত্তরকূটের পুরদেবতা, আমাদের জয়ে তাঁরই জয়। সেইজন্যেই আমাদের পক্ষ নিয়ে তিনি তাঁর নিজের দান ফিরিয়ে নিয়েছেন। তৃষ্ণার শূলে শিবতরাইকে বিদ্ধ করে তাকে তিনি উত্তরকূটের সিংহাসনের তলায় ফেলে দিয়ে যাবেন।”^১

প্রত্যুত্তরে বিশ্বজিৎ বলেছে, – ‘তবে তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।’^২

অর্থাৎ পূজা যেখানে বেতন, দেবতা সেখানে ভূত। অভিজিৎ মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে দিয়ে দেবতাকে দাসত্ব থেকে, অর্ধ্যাকে বৃত্তিত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। বাঁধের বন্ধন ভেঙে মুক্তধারার এ মুক্তি দেবলজ্জ্বী মনিবত্ব থেকে মানুষের মুক্তি, ভূত থেকে দেবতার মুক্তি। মুক্তধারার বাঁধ ভাঙার ফলে যন্ত্রদানবের পতন ঘটল। এই পতন বন্ধন মুক্তির সংকেত। বাঁধের ওপর ঐ লৌহযন্ত্রের অস্তিত্ব বন্ধনের প্রতীক।

‘মুক্তধারা’ নাটকের ভাব প্রকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথ চরিত্র ও ঘটনাস্রোতের চেয়ে পারিপার্শ্বিক আবহমণ্ডলের ওপর বেশি নির্ভর করেছেন। বাঁধের লৌহযন্ত্র ও ভৈরব মন্দিরে শীর্ষচারী ত্রিশূল সেই আবহমণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মন্দিরগামী পথ, সেই পথে মন্দির যাত্রীর অবিরাম পদসঞ্চারণ, গম্ভীর মন্তোচ্চারণ, যন্ত্রের মহিমস্তোত্র সহকারে যন্ত্ররাজকে কাঁধে নিয়ে উল্লসিত জনতার প্রবেশ-প্রস্থান, পূজা ভৈরবের না যন্ত্ররাজ বিভূতির তৎসম্পর্কিত সংশয়, পুত্রহারা অম্বার বিলাপ, পৌত্রহারা বটুকের সতর্কবাণী, আসন্ন অমাবস্যার রাত্রি, দিবাসনে আলোকবিলুপ্ত সায়াহ্নের ম্লান আকাশ শোকে, সন্ত্রাসে ও সতর্কতায় যে আবহ সৃষ্টি করেছে সে আবহাওয়ার মধ্যে দৃশ্যমান লৌহযন্ত্রটা উত্তরকূটের উদ্ধত স্পর্ধা, আর বিপরীত দিকে ভৈরবের মন্দিরচূড়ায় বিরাজমান ত্রিশূলের নিঃশব্দ ত্রিধায় আসন্ন প্রলয়ের অচপল বিদ্যুৎশিখা। যা কুন্দনের সংলাপে স্পষ্ট –

“দিনের বেলায় ও সূর্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এসেছে, অন্ধকারে ও রাত্রিবেলাকার কালোর সঙ্গে টক্কর দিতে লেগেছে। ওকে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। ও যেন একটা বিকট চিংকারের মতো।”^৩

অন্যদিকে রণজিতের মনে হয়েছে, -

“দেখেছ ওর পিছন থেকে সূর্য যেন বাকরুদ্ধ হয়ে উঠেছেন? আর, ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মতো দেখাচ্ছে।”^৪

আবার মন্ত্রী বলেছেন, -

“আমাদের আকাশের বুক যেন শেল বিঁধে রয়েছে মনে হচ্ছে।”^৫

অর্থাৎ সূর্যাস্তের প্রেক্ষাপটে যন্ত্র আর ত্রিশূলের দুই রূপ। যা উত্তরকূটের প্রথম নাগরিকের কথায় স্পষ্ট - ‘সূর্য অস্ত গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে এল, কিন্তু বিভূতির যন্ত্রের ঐ চূড়াটা এখনো জ্বলছে। রোদ্দুরের মদ খেয়ে যেন লাল হয়ে রয়েছে।’^৬ দ্বিতীয় নাগরিকের কথায়, ‘আর ভৈরবমন্দিরের ত্রিশূলটাকে অস্তসূর্যের আলো আঁকড়ে রয়েছে যেন ডোববার ভয়ে। কী রকম দেখাচ্ছে!’^৭ এ দুটি প্রতীকের অবস্থানই যে শুধু পরস্পর বিপরীত তা নয়, তাদের স্বরূপও পরস্পর বিরোধী। একটি স্পর্ধার অন্যটি প্রলয়ের, একটি বন্ধনের অন্যটি বন্ধন বিমুখ মুক্তির প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমতী রানু অধিকারীকে একটি পত্রে লিখেছিলেন আমি সম্মত সপ্তাহ ধরে একটি নাটক লিখছিলাম- শেষ হয়ে গেছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নয় এর নাম ‘পথ’। [ভানুসিংহের পত্রাবলী, পত্র ৪৩] ‘মুক্তধারা’র মধ্যে যে গতি, পথের মধ্যেও সে গতি। গতি পথের প্রতীক। আবার অবিরাম গতিতেই জীবনের সার্থকতা, গতিই জীবনের স্বরূপ। সুতরাং সমীকরণের নিয়মে পথই জীবন, -

পথ = গতি,
আবার জীবন = গতি,
সুতরাং জীবন = পথ।

- এই জন্যেই মুক্তধারার বন্ধ স্রোতপথ বন্ধ জীবনের প্রতীক, নন্দিসংকটের রুদ্ধ পথ রুদ্ধ জীবনের প্রতীক, গৌরীশৃঙ্গের অকৃত পথ অনাগত জীবনের প্রতীক। বাঁধের ওপর যন্ত্রটা তাই জীবনের গতি অবরোধের প্রতীক, ত্রিশূল সে অবরোধ ভেঙে জীবনের স্রোতে স্বভাবের গতি সঞ্চারিত করার প্রলয় আহ্বান।

যন্ত্র মানবসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন নয়। যতক্ষণ যন্ত্র প্রাণের সহায়, সৌন্দর্য, কল্যাণ ও আনন্দের অনুকূল ততক্ষণই তার টিকে থাকার অধিকার। যখন মানুষেরা প্রতিকূল হয়ে ওঠে, প্রাণকে আঘাত করে, তখন কাল ভৈরবের ত্রিশূল যন্ত্র ভাঙার ডাক দেয়, জন্মযাত্রী অভিজিৎরা প্রাণ দিয়ে যন্ত্রকে চুরমার করে। পৃথিবীতে মন্ত্রী বলছে, ‘মার লাগিয়ে জয়ী হব, মারকে ছাড়িয়ে উঠে জয়ী হও’, আর মানুষ বলছে, ‘প্রাণের দ্বারা যন্ত্রের হাত থেকে মুক্তি দিতে হবে।’^৮ অভিজিৎ এই মুমুক্ষু মানুষের প্রতিনিধি। বিভূতি বলে উত্তরকূট যন্ত্রের রাজত্ব, অভিজিৎের মতে উত্তরকূট যন্ত্রোত্তর রাজত্ব। বিভূতির যন্ত্রের মধ্যেই রয়েছে যন্ত্রনাশের রক্ত। সে রক্তপথেই নেমে এলো তার ধ্বংস। বাঁধের ওপর বিকট লৌহযন্ত্রটা যন্ত্র-রাজত্বের প্রতীক। যন্ত্র যখন প্রাণের স্থান জবরদখল করে মানুষের মানবিক সম্পর্কে বিযাক্ত করে তোলে, যন্ত্র যখন মানুষের হাতে প্রগতিবিধায়ক

উপকরণ না হয়ে মানুষকে নিজের উপকরণে পরিণত করে জীবনের মাধুর্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণকে ধ্বংস করে তখনই যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময়। ত্রিশূল সে অনিবার্য বিদ্রোহের অশনি-সংকেত। রবীন্দ্রনাথ জীবন এবং জীবনবিরোধী তত্ত্বকে ভৈরব মন্দির চূড়ার ত্রিশূল এবং অভভেদী লৌহযন্ত্রের মাথার প্রতীকে রূপায়িত করেছেন।

‘মুক্তধারা’ নাটকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিকতা ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। অভভেদী লৌহযন্ত্র এবং ভৈরব-মন্দির চূড়ার ত্রিশূল শুধু দুটি প্রতীক নয়, বরং সভ্যতা ও প্রকৃতির সংঘাত, জাগতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বন্দ্ব মানুষের স্বাধীনতার চূড়ান্ত প্রত্যয় এর দ্যোতনা বহন করে। এই প্রতীক দুটি রবীন্দ্রনাথের গভীরে প্রোথিত দার্শনিক চিন্তা এবং মানবমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তোলে।

Reference:

১. ঠাকুর, শ্রীরবীন্দ্রনাথ, ‘রবীন্দ্র-নাটক সমগ্র’ (দ্বিতীয় খন্ড), কামিনী প্রকাশালয়, ২০০৩, পৃ. ১০
২. তদেব, পৃ. ১০
৩. তদেব, পৃ. ৩৩
৪. তদেব, পৃ. ১৩
৫. তদেব, পৃ. ১৩
৬. তদেব, পৃ. ২৯
৭. তদেব, পৃ. ২৯
৮. তদেব, পৃ. ৩০

Bibliography:

- বিশী, প্রমথনাথ, ‘রবীন্দ্রনাট্য প্রবাহ’, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৪৮
- বন্দ্যোপাধ্যায়, কনক, ‘রবীন্দ্র নাট্য সমীক্ষা’, এ. মুখার্জী আন্ড কোং প্রা: লি: ১৯৫০
- ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ, ‘রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা’, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৪
- হালদার, গোপাল, ‘রবীন্দ্রনাথ শতবার্ষিকী প্রবন্ধ-সংকলন’, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৬১
- মৈত্র, সুরেশচন্দ্র, ‘বাংলা নাটকের বিবর্তন’, রত্নাবলী, ১৯৭৩
- শিকদার অশ্রুকুমার, ‘রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য’, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩
- ঘোষ, জগন্নাথ, ‘রবীন্দ্রনাট্য সাহিত্যে সাংকেতিক নাটক ও মুক্তধারা’, সাহিত্য সঙ্গী, ২০০২
- মুখোপাধ্যায়, দুর্গাশংকর, ‘নাট্যতত্ত্ব বিচার’, করুণা প্রকাশনী, ২০০৩
- মিশ্র, অশোক কুমার, ‘রবীন্দ্রনাট্যে রূপ: অরূপ’, দে’জ পাবলিশিং, ২০১১
- মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, ‘রবীন্দ্রনাথের মুক্তধারা’, গ্রন্থ বিকাশ, ২০১২
- মিত্র, শম্পা, ‘মুক্তধারা মুক্ততন্ত্রের দিকে যাত্রা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১২